ইউনিট ১

ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা ঃ বাবুর ও হুমায়ুন

ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষের অরাজক রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবুর এদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। রাজত্বকালের পুরো সময়েই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি বংশধরদের জন্য একটি সুসংগঠিত রাজ্য রেখে যেতে পারেননি। এ কারণে হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করার পরই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। দিল্লীর সিংহাসন তাঁর হাত-ছাড়া হয়ে যায়। তবে দীর্ঘ পনের বছর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাবুরের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, কিভাবে বাবুর এদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর পুত্র হুমায়ুনের শাসন কেমন ছিল তা এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আলোচিত হয়েছে।

পাঠ ১

মুঘল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- মুঘল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- তৎকালীন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুঘল বিজয়ের প্রাক্কালে এদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিতে পারবেন।

দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উত্থান

বাদশাহ বাবুরের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে দিল্লী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন সুলতান ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৫ খ্রিঃ)। ইব্রাহিম লোদী সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুলতান হলেও, তিনি কূটনীতিতে দক্ষ ছিলেন না। তাই তিনি সামন্ত রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। তাছাড়া দিল্লীর পূর্ববর্তী সুলতানগণ ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্যবর্গ ও রাজপুতগণকে পরাজিত করলেও তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে পারেননি। ফলে তুঘলক বংশের শাসনের (১৩২০-১৪১৩) শেষের দিকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। ভারতের সুদূর দক্ষিণে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য, উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও জৌনপুর রাজ্য, পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব, মালব ও গুজরাটে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বাধীনতা প্রিয়। এদের সাথে বিরোধের ফলে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বাবুর এদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবুরের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে দৌলতখান লোদী স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন।

ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী দৌলত খানের স্বাধীন শাসনের বিরোধিতা করায় উভয়ের মধ্যে দারুণ শত্রুতা দেখা দেয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর খালাত ভাই আলম খান লোদী বিদ্রোহী দৌলত খান লোদীর সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খানও দৌলত খানের সাথে যোগদান করেন। তাঁরা দিল্লীর লোদী শাসনের অবসানের জন্য কাবুলে অবস্থানরত বাবুরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব

দিল্লীর লোদী সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে মালব অন্যতম। মালব রাজ্যটি ছিল রাজপুতনা ও বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি:) মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৬ শতকে মালবের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর রাজপুত সামন্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। সামরিক দিক থেকে মালবের অবস্থান ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া গুজরাটেও একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এ রাজ্যটি ছিল সমৃদ্ধশালী। গুজরাটের বন্দর থেকে বহু পণ্য পশ্চিম এশিয়ায় রপ্তানি হত। এ জন্য পর্তুগীজ বণিকরা গুজরাটের উপকূলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। গুজরাটের সুলতান শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজদের দমন করতে সক্ষম হন। রাজপুতনায় অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। দিল্লীর সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে এসব রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে মেবার ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সংগ্রাম সিংহ বা রানা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন মেবারের শাসনকর্তা। তিনি রাজপুতদের নেতা ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত ছিল। ইব্রাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে সংগ্রাম সিংহ দিল্লী অধিকারের ইচ্ছা পোষণ করেন।

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজ প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাহমনী রাজ্যের সাথে তাঁর সংঘাত শুরু হয়। অন্যদিকে উত্তর ভারতে কাশ্মীর রাজ্যেও তখন গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল। পূর্ব ভারতের বাংলায় সুলতান হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য সীমানা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এদেশে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ। এমনি অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বহির্শক্তি ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়। বাবুর ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে এদেশ আক্রমণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

বাবুরের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। তখন দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তিনি উচ্চাভিলাষী হলেও কূট-কৌশলী ছিলেন না। ফলে অমাত্যবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কম ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের দৌলত খান লোদী সুলতানের চরম বিরোধিতা করেন এবং ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বাবুরকে আমন্ত্রণ জানান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. বাবুরের ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালে দিল্লীর সুলতান ছিলেন—

ক. সেকান্দর লোদী খ. বাহলুল লোদী

গ. ইব্রাহিম লোদী ঘ. দৌলত খান লোদী

২. দৌলত খান লোদী শাসন করতেন —
   ক. মালব খ. পাঞ্জাব
   গ. কাশ্মীর গ. বাংলা

৩. মালব স্বাধীন হওয়ার সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন —
   ক. গিয়াসউদ্দীন তুঘলক খ. মুহম্মদ বিন তুঘলক
   গ. নাসির উদ্দিন তুঘলক ঘ. ফিরোজ শাহ তুঘলক

৪. সংগ্রাম সিংহ শাসন করতেন —
   ক. মালব খ. গুজরাট
   গ. মেবার ঘ. বুন্দেলখণ্ড

৫. বাবুরের ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন —
   ক. হুসেন শাহ খ. নুসরৎ শাহ
   গ. আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. মুঘল বিজয়ের পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
২. মুঘল বিজয়ের পূর্বে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল কেন?
৩. মুঘল বিজয়ের পূর্বে এদেশের ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

পাঠ ২

বাবুরের ভারত জয় ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- বাবুরের বাল্যজীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাবুরের ভারত জয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- পানিপথ যুদ্ধে বাবুরের জয়লাভের কারন ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করতে আরও যে সকল যুদ্ধে অবতীর্ন হতে হয়েছিল তার বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাদশাহ বাবুরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

সম্রাট বাবর

জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবুর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃকূলে বাবুর ছিলেন বিখ্যাত তুর্কী তৈমুর লং-এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতৃকূলে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান। উপমহাদেশে বাবুরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মুঘল বংশ নামে পরিচিত হয় মোঙ্গলদের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকার কারণেই। বাবুর ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফারগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওমর মির্জা ফারগনার শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাবুর বার বছর বয়সে ফারগনার অধিপতি হন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ একাধিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দখল করেন। কিন্তু অচিরেই বাবুরের নিকট আত্মীয় পরিজন, রাজন্যবর্গ ও উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরুদ্ধাচারণের ফলে ফারগানা ও সমরখন্দ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। তিনি রাজ্য হারা হয়ে দাবা খেলার রাজার মত ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং স্বদেশের আশা ত্যাগ করে হিন্দুকুশ অতিক্রম করেন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে উজবেক শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাবুর কাবুল জয় করেন। কাবুল বিজয়ের পরও বাবুর পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার ও রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ

বাবুরের ভারত অভিযান

বাবুরের ভারত অভিযান আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। ঐতিহাসিকদের মতে মধ্য এশিয়ায় বাবুরের ভাগ্য বিপর্যয় তাঁর ভারত অভিযানের অন্যতম কারণ। তাছাড়া হিন্দুস্তান ও কাবুলের সান্নিধ্য, ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নেতৃবর্গের আমন্ত্রণ বাবুরের ভারত অভিযানের পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ভারতের দিল্লীর শাসক ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধের পূর্বেও বাবুর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এসব অভিযানকে প্রাথমিক অভিযান বলা হয়ে থাকে। ১৫১৯ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাবুর ভারতে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে অতি সহজেই বজৌর দুর্গ, ভীরা, কুশব ও চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল দখল করেন। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ও কতিপয় আফগান অমাত্য বিশেষ করে আলম খানের আমন্ত্রণক্রমে বাবুর সসৈন্যে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন এবং লাহোর, দিপালপুর ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। এ বিজয়ের পর বাবুর পাঞ্জাবকে কয়েকভাগে

ভারতে বাবরের প্রাথমিক অভিযান

বাবরের শিবির জীবন

ভাগ করে দৌলত খানের পুত্র দিলওয়ার খান, ইব্রাহিম লোদীর চাচা আলম খান এবং মুঘল আমীরদেরকে প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়ে কাবুলে ফিরে যান। বাবুরের অনুপস্থিতিতে দৌলত খান পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করেন এবং আলম খান ও দিলওয়ার খানকে বিতাড়িত করেন। আলম খান বাধ্য হয়ে কাবুলে আশ্রয় নেন এবং বাবুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবুর পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সহজে পাঞ্জাব জয় করেন এবং দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। ইব্রাহিম লোদী দিল্লী রক্ষার জন্য বাবুরকে পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাঁধা দিলে উভয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

ভারতবর্ষে বাবুরের প্রাথমিক বিজয় তাঁকে দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য উৎসাহিত করে। সে লক্ষে তিনি দিল্লীর অদূরে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ এপ্রিল দিল্লীর লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। বাবুর তাঁর আত্মজীবনী তুযুক-ই-বাবুরী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়ে তাঁর সাথে বার হাজার (মতান্তরে আট হাজার) সৈন্য ছিল। তাছাড়া পাঞ্জাব জয়ের পর কিছু অতিরিক্ত সৈন্যও তাঁর সাথে যোগদান করে। তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র হুমায়ুনও তাঁর সাথে যোগদান করেন। এ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। পানিপথ প্রান্তরে বাবুর প্রতিরক্ষা কৌশল হিসেবে পরিখা খনন করেন এবং কামান ও গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে এই প্রথম কামানের ব্যবহার করা হয়। এ যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হন।

পানিপথের যুদ্ধে বাবরের বিজয় ও ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়

বাবরের পানিপথের যুদ্ধ পরিচালনা

যুদ্ধে বাবুরের সাফল্যের কারণ

এ যুদ্ধে বাবুরের বিজয়ের মূল কারণগুলো হচ্ছে:

১. বাবুরের সৈন্য ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য অপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত ছিল।

২. ইব্রাহিম লোদীর অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা বাবুরের অস্ত্রশস্ত্র অধিক উন্নতমানের ছিল। এ যুদ্ধে বাবুর কামান ব্যবহার করেন।

৩. বাবুর ছিলেন একজন দক্ষ সেনানায়ক। তিনি ইব্রাহিম লোদীর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে দক্ষতার সাথে এবং উন্নত যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করে জয় লাভ করেন। তাছাড়া যুদ্ধ পরিচালনায় ইব্রাহিম লোদী অপেক্ষা বাবুর অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

৪. ইব্রাহিম লোদীর আত্মীয় স্বজনের ষড়যন্ত্র ইব্রাহিম লোদীকে যেমন দুর্বল ও শক্তি হীন করে বিপরীত দিকে বাবুরকে যুদ্ধে ভীষণভাবে উৎসাহ প্রদান করেছিল।

৫. বাবুর প্রথম ভারতবর্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র কামান ব্যবহার করেন। তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ছিল।

৬. বাবুর উজবেগী ও তুর্কীদের নিকট থেকে নতুন রণকৌশল শিখেছিলেন। এ কৌশলকে বলা হত 'তুলঘুমা' যুদ্ধরীতি। এ রীতি মোতাবেক তিনি যুদ্ধে পরিখা খনন, সৈন্যদের মাঝে ব্যুহ রচনা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও অশ্বারোহী দ্বারা আক্রমণ পরিচালনা করেন।

পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল

পানিপথের যুদ্ধের ফলে- ১. বাবর ভারতে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করেন; ২. ভারতবর্ষে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবর্তন করেন; ৩. এদেশে পাওয়া ধন-রত্ন বিতরণ করে সমর্থন আদায় করেন; ৪. বাবর ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে বাবুরের বিজয়ের ফলে ভারতের তুর্কী আফগান দীর্ঘ শাসনের (১২০৩-১৫২৬ খ্রিঃ) অবসান ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে বাবুর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে লোদী সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর মুঘল বংশের বুনিয়াদ বা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধের ফল হিসেবে ভারতের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে বাবুরের হাতে চলে যায়। পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বাবুর মুঘল বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষে গোলন্দাজ বাহিনী প্রবর্তন করেন। এ যুদ্ধে বাবুরের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। রাশব্রুক উইলিয়ামস বলেছেন যে, "পানিপথের জয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে; তখনও আফগান উপজাতি সমূহের বিরোধিতা ছিল প্রধান বাধা"। পানিপথের যুদ্ধে জয়ের পর বাবুর দিল্লী ও আগ্রায় বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন এবং এ সম্পদ বিতরণ করে তিনি সহযোগীদের সমর্থন আদায় করেন। তাছাড়া পানিপথের জয়ের পর বাবুর ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজত্ব কায়েমের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাবুরের অধিকারে আসে। বহু আফগান সর্দার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

সুতরাং পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে বলা যায় যে ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তারে পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি মুঘল প্রাধান্য বিস্তারে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ভূমিকাও ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

খানুয়ার যুদ্ধ, ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ

ভারতের অন্যান্য শক্তির মধ্যে রাজপুত শক্তি ছিল অন্যতম। রাজপুতানার মেবারের অধিপতি ছিলেন রানা সংগ্রাম সিংহ। সংগ্রাম সিংহ আশা করেছিলেন যে বাবুর তাঁর পূর্বপুরুষের ন্যায় দিল্লী লুট করে স্বদেশে ফিরে যাবেন। তখন তিনি ইব্রাহিম লোদীর রণক্লান্ত সেনাবাহিনীকে সহজেই পরাস্ত করে মুসলিম শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য কায়েম করবেন। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে জয় লাভের পর বাবুরের ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাসের বাসনার কথা জেনে সংগ্রাম সিংহ এক শক্তিশালী রাজপুত বাহিনী গঠন করেন। বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবর্গ, আজমীর, মারওয়াড়, আম্বর ও চান্দেরীর রাজপুতগণ এবং মেওয়াটের হাসান খান তাঁর দলে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে বাবুরের সৈন্যগণ আতংকিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ না করে কাবুলে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। সেনাদলের মনোবল

বৃদ্ধির জন্য বাবুর দু'টি কাজ করেন। তিনি নিজের পানপাত্র ভেঙ্গে ফেলেন এবং তাঁর সোনার ও রূপার পানপাত্রগুলো বিতরণ করে দেন। বাবুর জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমেও সৈন্যদেরকে উদ্দীপ্ত করেন এবং আগ্রার পশ্চিমে খানুয়ার প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেন।

বাবর কর্তৃক শক্তিশালী রাজপুত বাহিনীর পরাজয়।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ খানুয়ার প্রান্তরে রানা সংগ্রাম সিংহ এবং বাবুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় ১০ ঘন্টার যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী অসাধারণ বিক্রম দেখালেও বাবুরের রণকৌশল শেষ পর্যন্ত রাজপুতদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। বাবুর এ যুদ্ধেও তুলঘুমা যুদ্ধ রীতি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা রাজপুত শক্তিকে ধ্বংস করেন। সংগ্রাম সিংহ আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সহযোগীরা তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব

খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের বিজয়ে ভারতে মুগল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ প্রশস্ত হয়।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সংগ্রাম সিংহের ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়। শক্তিশালী মুঘলদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য আর কোন শক্তি রইল না। রাজপুত শক্তি পতনের ফলে আফগানরাও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ রাজপুতদের সাথে যোগ দিয়ে জোট গড়ার সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে যায়। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতে মুঘল শক্তির ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং বাবুর কাবুল থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। অতঃপর তিনি সহজে মালবের মেদিনী রায়কে পরাস্ত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক খানুয়ার যুদ্ধকে বক্সারের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে বক্সার যেমন একটি নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ, ভারতে মুঘল শক্তির উত্থানে খানুয়ার যুদ্ধও ছিল তদরূপ।

ফলাফল

১. খানুয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে মুঘল শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
২. বাবুরের ভারতবর্ষ আক্রমণকালীন সময়ে এদেশে দুই পরাক্রমশালী শক্তি ছিল। যেমন আফগান ও রাজপুত। পরপর দু'টি যুদ্ধে বিজয়ের ফলে উভয় শক্তি বিনষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে মুঘল শক্তির উত্থানের পথ চির উন্মুক্ত হয়।
৩. খানুয়ার প্রান্তরে জয়লাভের পর মুঘলদের কেন্দ্রীয় রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লীতে স্থানান্ত রিত হয়।
৪. খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবুর অন্যান্য রাজপুতদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

গোগরার যুদ্ধ, ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ

ভারতবর্ষের দু'টি বৃহৎ শক্তি ইব্রাহিম লোদী ও রানা সংগ্রাম সিংহ বাবুরের নিকট পরাজিত হলেও পূর্ব ভারতের আফগানগণ তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। বাংলার সুলতান নুসরৎ শাহের আশ্রয়ে আফগান সর্দারগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। বিহারের শের খান, জৌনপুরের মুহম্মদ লোদী এবং নুসরৎ শাহ একযোগে দিল্লী আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বাবুরের বাহিনী দ্রুত কনৌজ, বারাণসী, এলাহাবাদ দখল করে বিহার সীমান্তে গোগরা নদীর তীরে উপনীত হলে মুহম্মদ লোদী ও শের খান বাধা দেন। কিন্তু সুশিক্ষিত মুঘল বাহিনীর নিকট আফগান বাহিনী পরাজিত হয়। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ লোদী বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরৎ শাহের শরণাপন্ন হন। কিন্তু বাবুরের সঙ্গে নুসরৎ শাহের এক সন্ধি হয়। এর ফলে বাংলার সুলতান মুঘল আফগান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে বাবুর

গোগরার যুদ্ধে বাবরের বিজয় উপমহাদেশে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ চূড়ান্তভাবে প্রশস্ত করে।

নুসরৎ শাহের রাজ্য সীমা মেনে নেন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করেন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বাবুরের বিজয় অভিযান সমাপ্ত হয়। বাবুর আমুদরিয়া থেকে গোগরা এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হন। এভাবে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন বাবুর আগ্রায় ইন্তেকাল করেন।

মুগল সৈন্য বহরের যুদ্ধযাত্রা

বাবুরের চরিত্র

মধ্য এশিয়ার যাযাবর যোদ্ধার চরিত্র বাবরকে সাফল্য এনে দিয়েছিল।

তুর্কী ভাষায় 'বাবুর' শব্দের অর্থ 'সিংহ'। বাবুরের চারিত্রিক গুণাবলী ও দৃঢ়তার জন্য তাঁর এ নামকরণ যথার্থ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মধ্য এশিয়ার দুই প্রধান বিজেতা তৈমুর ও চেঙ্গিসের রক্ত তাঁর দেহে প্রবহমান ছিল। বাবুরের চরিত্রে উভয় দেশের উভয় নেতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়ার একজন যাযাবর যোদ্ধা। যোদ্ধা জাতিসুলভ স্বভাব নিয়ে সমরখন্দ, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণ করেন। মধ্য এশিয়ার জন্য তাঁর ভালবাসা ছিল আন্তরিক। মধ্য এশিয়ার লোকদের স্বভাব অনুযায়ী বাবুর যুদ্ধকে জীবনের এক স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে মনে করতেন।

বাবর একদিকে ছিলেন আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ যোদ্ধা অন্যদিকে ছিলেন কোমল হৃদয়বান।

জয় বা পরাজয়ে তিনি ছিলেন অবিচলিত। যুদ্ধের প্রয়োজনে চরম নিষ্ঠুরতা দেখালেও তিনি স্বভাব-নিষ্ঠুর ছিলেন না। যুদ্ধের মধ্যেও তিনি উদ্যান রচনা ও মসনভী বা কবিতা রচনার কথা ভাবতেন। বস্তুত বাবুরের হৃদয় ছিল কোমল। তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আত্মবিশ্বাসী, বিপদে তিনি ধৈর্য হারাতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তিনি শত্রুপক্ষের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতেন। সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বাবুর ছিলেন ফরাসী বীর নেপোলিয়নের মত আত্মনির্ভরশীল এবং ধৈর্যশীল। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "যোদ্ধা, শাসক ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে বাবুর মধ্যযুগের একজন আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি ছিলেন।" বাবুর ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু। রাজ্যহারা হয়ে তিনি বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন। তবুও তিনি হতোদ্যম হননি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন স্নেহবৎসল পিতা।

শাসক হিসেবে বাবুরের কৃতিত্ব

বাবর ছিলেন একজন সফল বিজেতা ও দক্ষ প্রশাসক।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে বাবুরের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি মুঘল শক্তিকে ভারতমুখী না করতেন তাহলে মধ্য এশিয়ায় হয়ত উজবেগ জাতির সাথে সংঘর্ষে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করে একক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজপুত এবং আফগান শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে পরবর্তীকালে আকবরের সাম্রাজ্য গড়ার কাজ সহজ করেছিলেন। তিনি 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ এবং সিংহাসনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক এ আর শর্মার মতে, "বাবুর একটি রাজবংশ এবং একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।" বাবুরের সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মাত্র চার বছর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রিঃ) রাজত্ব করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে শাসন কাঠামোর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। তবে তিনি বাদশাহ ও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী (ভকিল) নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), শিকদার (সমরকর্তা) ও কোতোয়াল বা নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তবে তিনি সামন্ত ও জায়গীরদারদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করেন।

বাবরের মৃত্যু

শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী হিসেবে বাবুরের কৃতিত্ব

বাবর ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও নির্মাতা।

বাবুর শুধুমাত্র একজন শাসক ও যোদ্ধাই ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত 'তুযুক-ই-বাবুর' বা বাবুরের আত্মজীবনী তুর্কী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। বাবুর দিল্লী ও আগ্রায় বেশ কয়েকটি অট্টালিকা, উদ্যান এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নর্দমা নির্মাণ করেছিলেন।

বাবুর পরাজিত আফগান ও রাজপুতদের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে মৈত্রী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে "আকবরের রাষ্ট্রনীতির বীজ তাঁর প্রখ্যাত পিতামহ রোপণ করেন।" বাবুর ছিলেন মধ্যযুগের একজন আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি।

সার-সংক্ষেপ

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবুর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবুর পিতৃরাজ্য ফারগানা হারিয়ে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে কাবুলের সিংহাসন দখল করেন। কাবুল থেকে বাবুর ভারতবর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁকে এদেশ বিজয়ে উৎসাহিত করে। বাবুরের এদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল আক্রমণের প্রাথমিক সাফল্য এবং পরবর্তী কালে পানিপথের, খানুয়ার ও গোগরার যুদ্ধের সাফল্য এদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. বাদশাহ বাবুর জন্মগ্রহণ করেন —
   ক. সমরখন্দে খ. বোখারায়
   গ. ফারগানায় ঘ. তাসখন্দে

২. বাবুর কাবুলের সিংহাসন দখল করেন —
   ক. ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে

৩. বাবুরের ভারতবর্ষ অভিযানের অন্যতম প্রধান কারণ —
   ক. হিন্দুস্তান ও কাবুলের সান্নিধ্য খ. ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা
   গ. ভারতীয় নেতৃবর্গের আমন্ত্রণ ঘ. ক, খ, গ

৪. লোদী বংশের শেষ সুলতানের নাম —
   ক. বাহলুল লোদী খ. সিকান্দর লোদী
   গ. ইব্রাহিম লোদী ঘ. দৌলত খান লোদী

৫. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় —
   ক. ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে

৬. খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত নেতৃত্ব গ্রহণ করেন —
   ক. মেদিনী রায় খ. যশোবন্ত সিংহ
   গ. রাণা সংগ্রাম সিংহ ঘ. মানসিংহ

৭. ভারতবর্ষে বাবুরের শেষ বিজয় অভিযান —
   ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ. খানুয়ার যুদ্ধ
   গ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘ. গোগরার যুদ্ধ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. বাবুরের বাল্যজীবন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩. খানুয়ার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল কি ছিল?
৪. শাসক হিসেবে বাদশাহ বাবুরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ ৩

বাদশাহ হুমায়ুনের শাসনকাল ঃ ১৫৩০-১৫৪০ খ্রিঃ ও ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিঃ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- সিংহাসনে আরোহণ করে হুমায়ুন যে সব বাঁধার সম্মুখীন হন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুমায়ুনের সাথে শের শাহের সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাহাদুর শাহের সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষের বিবরণ দিতে পারবেন।
- হুমায়ুনের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাদশাহ হুমায়ুনের শাসনামলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় ১৫৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মাঝখানে ১৫ বছর তিনি পারস্যে প্রবাস জীবন যাপন করেন।

বাদশাহ হুমায়ুনের সিংহাসন লাভ এবং বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণকালীন সময়ে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অস্থিতিশীল ও বিপদসংকুল। পূর্বদিকে আফগানগণ এবং পশ্চিমে গুজরাটের শাসক বাহদুর শাহ মুঘল প্রভুত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ান। হুমায়ুনের আপন ভাইয়েরাও নানাবিধ অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাঁর ভগ্নিপতি মুহম্মদ জামান মীর্জা এবং চাচাতো ভাই মুহম্মদ সুলতান মীর্জাও দিল্লীর সিংহাসনের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দেন। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত মুঘল সৈন্যবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হুমায়ুনের সাম্রাজ্যও সুগঠিত ছিল না। এমনি বৈরী অবস্থা থেকে উত্তরণে ব্যর্থ হলে হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত হন।

সম্রাট হুমায়ুন

হুমায়ুনের সাথে বাহাদুর শাহের সংঘর্ষ

সিংহাসনে আরোহণের ছয় মাসের মধ্যে হুমায়ুন কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। তবে বিহারের শাসনকর্তা মাহমুদ লোদী বিদ্রোহ করলে তিনি অবরোধ উঠিয়ে ফেলেন এবং বিহার আক্রমণ করে মাহমুদ লোদীকে পরাস্ত করেন। হুমায়ুন এ বিজয়ের পর শের খানের চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। শেরখান হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি (হুমায়ুন) আগ্রায় ফিরে আসেন। কিছু দিনের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে শেরখান এবং গুজরাটে বাহাদুর শাহ তাঁদের নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। এ সংবাদে বাদশাহ শংকিত হয়ে পূর্বাঞ্চলের পরিবর্তে গুজরাটে বাহদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

গুজরাটে বাহাদুর শাহের মোকাবেলা

বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়নি।

গুজরাট কাথিয়াড়ের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। হুমায়ুনের আমলে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন বাহাদুর শাহ। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং হুমায়ুনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আফগান বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান এবং সাহায্য প্রদান করে তিনি হুমায়ুনের বিরাগভাজন হন। তাছাড়া মালব, রণথম্ভোর, রাজপুতনা ও চিতোর বিজয়ের পরিকল্পনা করলে তাঁর সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষ

অনিবার্য হয়ে পড়ে। হুমায়ুন বিদ্রোহী আমীরদেরকে ফেরত চেয়ে বাহাদুর শাহের সাথে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন আহমদাবাদে। কিন্তু বাদশাহ হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। এ সময়ে পূর্বাঞ্চলে শেরখান প্রভাবশালী হয়ে উঠলে বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ দমন সম্রাটের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

হুমায়ুনের সাথে শের খানের সংঘাত

শের খানের উত্থান

শের খান ছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বিহার প্রদেশের আফগান নেতা। শের খান বাদশাহ বাবুরের জীবদ্দশাতেই বিহারের অন্তর্গত সাসারামের সামন্ত শাসক। পরবর্তীকালে তিনি চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্নী লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গের অধিপতি হন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে শের খান তাঁর সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং সময়োচিত আনুগত্য স্বীকার করে নিজকে রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা জামাল খান লোহানী বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের সাহায্যে শেরখানের কর্তৃত্ব লোপ করতে সচেষ্ট হন। শের খান এই সম্মিলিত বাহিনীকে সুরাজগড়ের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিহারের অবিসংবাদিত অধিপতি হন। অতঃপর শের খান বাংলার প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি উপর্যুপরি দু'বার বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী গৌড়ের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন।

হুমায়ুনের বাংলায় আগমন এবং চুনার দূর্গ জয়

বাদশাহ হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলে শের খানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রমাদ গুণেন এবং তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। বাংলাদেশের পথে হুমায়ুন চুনার দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। চুনার দুর্গ জয় করে হুমায়ুন দীর্ঘ ছয় মাস বাংলায় অতিবাহিত করেন। এ সুযোগে শের খান বানারস, জৌনপুর অধিকার করেন।

চৌসার যুদ্ধ : ১৫৩৯ খ্রিঃ হুমায়ুনের পরাজয় শের খানের "শেরশাহ" উপাধি

সুচতুর শের খান হুমায়ুনের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। তিনি বিহার ও জৌনপুরে মুঘল অধিকৃত অঞ্চল দ্রুত অধিকার করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। শের খান দিল্লীর সাথে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। ফলে হুমায়ুন আতংকিত হয়ে পড়েন এবং কাল বিলম্ব না করে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গা নদীর তীরে চৌসা নামক স্থানে শের খান তাঁর গতিরোধ করেন। এই দুঃসময়ে হুমায়ুন তাঁর ভ্রাতাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শেরখানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পরাজিত হন। হুমায়ুনের সৈন্য বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এতে অনেকের সলিল সমাধি ঘটে। হুমায়ুন কোন রকমে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ বাঁচান এবং আগ্রায় পৌঁছেন। কথিত আছে যে তিনি যখন গঙ্গায় নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হন তখন নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তাঁকে প্রাণে রক্ষা করেন। তিনি তাঁর প্রাণরক্ষাকারীকে বিপুল সম্মানে ভূষিত করেন এবং একদিনের জন্য দিল্লীর শাহী মসনদে বসান। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে বাংলা, বিহার, জৌনপুর, কনৌজ শের খানের হস্তগত হয়। তাঁর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তিনি ১৫৩৯ খ্রিঃ 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করেন। তিনি নিজের নামে খুৎবাহ পাঠ ও মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করেন।

বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০ খ্রিঃ)

হুমায়ূনের পরাজয়, সাময়িকভাবে মুগল সাম্রাজ্যের অবসান

চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি এবং ব্যর্থতার বেদনা সহ্য করতে না পেরে হুমায়ুন পুনরায় ভাইদের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি পাননি। তাই তিনি মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শেরশাহকে বাধা দেয়ার জন্য কনৌজের পথে অগ্রসর হন। অপর পক্ষে শেরশাহের সৈন্য সংখ্যা ছিল পনর হাজার। তিনি এ সৈন্য নিয়ে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে হুমায়ুনের মুখোমুখী হন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আগ্রার পথে পলায়ন করেন। শেরশাহ দ্রুত দিল্লী, আগ্রা অধিকার করে নিলে হুমায়ুন পারস্যের দিকে পলায়ন করেন। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতে সাময়িক ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং শেরশাহের নেতৃত্বে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

১. **শেরশাহের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক দক্ষতা**- শেরশাহ ছিলেন কৌশলী ও দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি হুমায়ুনকে গৌড় জয় করতে সুযোগ দিয়ে কৌশলে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে হুমায়ুনের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। চুনার এবং পরে গৌড়ে অযথা কালক্ষেপণ তাঁর অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে।

২. **বাবুরের সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক দুর্বলতা**- বাবুর যে সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা রেখে যান তা এত দুর্বল, কাঠামোহীন ও ভঙ্গুর ছিল যে হুমায়ুনের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বাবুর রাজকোষ শূন্য রেখে যান এবং তিনি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করে যেতে পারেননি।

৩. **সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য**- শেরশাহের সেনাবাহিনী যুদ্ধ নিপুণ সৈন্য দ্বারা সুগঠিত ছিল। কিন্তু হুমায়ুনকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলে তিনি সৈন্য বাহিনীকে সুগঠিত করার সময় ও সুযোগ পাননি।

৪. **হুমায়ুনের চারিত্রিক দুর্বলতা**- হুমায়ুন ছিলেন দুর্বল চিত্তের অধিকারী। তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি কোমলতা দেখিয়ে পরে অনুতাপ করতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেছেন যে হুমায়ুনের চরিত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জেদ ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল। তিনি কোন বিষয়ে আংশিক সফলতার পর আমোদ প্রমোদে অযথা সময় ব্যয় করতেন।

৫. **হুমায়ুনের ভাইদের বিরোধিতা**- হুমায়ুনের তিন ভাই কামরান, হিন্দাল এবং আসকারী বিপদের সময়ে হুমায়ুনকে কোনরূপ সাহায্য করেননি। ফলে একা হুমায়ুনের পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

৬. **আফগানদের নিরঙ্কুশ সমর্থন**- শেরশাহের প্রতি আফগানদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। অন্যদিকে হুমায়ুন তাঁর আপনজনের সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হন এবং ভারতের ভাগ্যাকাশে ধুমকেতুর মত শেরশাহের আবির্ভাব ঘটে।

হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ

অমরকোট ও পারস্যে হুমায়ুন

শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন বহু দুঃখ দুর্দশার মধ্যদিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যোধপুরে আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি অমরকোটে রানা প্রসাদের আশ্রয় প্রার্থী হন। রানা প্রসাদ তাকে আশ্রয় দেন এবং সিন্ধু ও যাট্টা পুনরুদ্ধারে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। অমরকোটে থাকা অবস্থায় হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদা বানুর গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয়। রানা প্রসাদের সাথে হুমায়ুনের মত বিরোধ দেখা দিলে তিনি হুমায়ুনকে সাহায্যদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। হুমায়ুন আশ্রয়ের আশায় কান্দাহারে ভাই আশকারীর স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু আশকারী সম্মত না হওয়ায় তিনি শিশু পুত্র আকবরকে কান্দাহারে রেখে পারস্য অভিমুখে রওনা হন। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে পৌঁছলে সম্রাট শাহ তামাসপ হুমায়ুনকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পারস্য সম্রাটের সাথে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে হুমায়ুনকে বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও তাঁর হৃত মুঘল রাজ্য পুনরুদ্ধারে সেনাবাহিনী ও অর্থ দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বিনিময়ে হুমায়ুন শাহ তামসপকে কান্দাহার ফিরিয়ে দিতে এবং শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করতে রাজী হন।

হুমায়ুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার

কাবুল, কান্দাহার, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার এবং মৃত্যুবরণ

পারস্য সম্রাটের সহয়তায় হুমায়ুন তাঁর ভাইদের পরাজিত করে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। কান্দাহার থেকে শিশুপুত্র আকবরকে উদ্ধার করা হয়। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বাসী সেনাপতি বৈরমখানের সহায়তায় হিন্দুস্তান পূনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দর শুরকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করেন। দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে তিনি মুঘল শাসন পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি বেশী দিন রাজ্য ভোগ করতে পারেননি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি হুমায়ুন দিল্লীতে তাঁর পাঠাগারের সিঁড়ি হতে পড়ে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু বরণ করেন।

হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

হুমায়ুনের চরিত্রে মমত্ববোধ, সহিষ্ণুতা সাহসিকতা ইত্যাদি সদগুন থাকলেও বিচক্ষণতার অভাব ছিল

হুমায়ুন শান্ত স্বভাব, দয়ালু ও বাৎসল্য প্রবন ছিলেন। তাঁর মধ্যে মমত্ববোধও ছিল অপরিসীম। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার মত দুর্লভগুণও তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। এছাড়াও তাঁর মধ্যে সমরদক্ষতা ও সাহসিকতারও অভাব ছিলনা। তবে তাঁর মধ্যে বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দুরদর্শীতার অভাব ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করার এবং আফগানদের বিরোধিতা মোকাবেলা করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করার প্রয়োজনীয় দুরদর্শিতা, কুটকৌশল ও ধৈর্য্য তাঁর ছিলনা। ঐতিহাসিক লেনপুল এর মতে, হুমায়ুনের চরিত্র ছিল আকর্ষনীয়, কিন্তু প্রভাবশালী নয়। ব্যক্তি জীবনে হয়ত মনোরম সঙ্গী ও বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন কিন্তু সম্রাট হিসেবে ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

সার-সংক্ষেপ

সম্রাট বাবুরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন আফগানদের সাথে বিশেষ করে শের খানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসন হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী কালে দীর্ঘ পনের বছর পর ১৫৫৫ খ্রি: তিনি দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেও বিজয়ের সুফল ভোগ করতে পারেন নি। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি পাঠাগাড়ের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন —
   ক. ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে

২. গুজরাটের শাসন কর্তার নাম —
   ক. মাহমুদ শাহ খ. জামাল খান
   গ. শের খান ঘ. বাহাদুর শাহ

৩. সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করেন —
   ক. ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে

৪. হুমায়ুনের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল —
   ক. লক্ষ্ণাবতীতে খ. গৌড়ে
   গ. মুর্শিদাবাদে ঘ. ঢাকায়

৫. চৌসার যুদ্ধ সংঘটিত হয় —
   ক. ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে

৬. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের বিলগ্রামের যুদ্ধ সংঘটিত হয় —
   ক. হুমায়ুন ও মুহম্মদ শাহের মধ্যে খ. হুমায়ুন ও জালাল খানের মধ্যে
   গ. হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে ঘ. হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহের মধ্যে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. সিংহাসন লাভের পর হুমায়ুন যে সব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আলোচনা করুন।
২. হুমায়ুনের সাথে বাহাদুর শাহের সংঘর্ষের ঘটনা বর্ণনা করুন।
৩. হুমায়ুন-শেরখানের যুদ্ধের বর্ণনা দিন।
৪. হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ সমূহ বর্ণনা করুন।

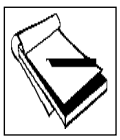

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১ ▶রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. সুলতান ইব্রাহীম লোদীর সাথে বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের বিরোধের বিবরন দিন।
২. বাবুরের ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিন।
৩. বাবুরের ভারত জয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানসমূহের বিবরণ দিন।
৪. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের বর্ণনা দিন। এই যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন।
৫. খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিপিবদ্ধ করুন।
৬. ভারত বর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাবুর যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার বর্ণনা দিন।
৭. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাবুরের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৮. হুমায়ুনের ব্যর্থতার এবং শেরশাহের সাফল্যের কারণ বর্ণনা করুন।

৯. সম্রাট হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা:

পাঠ - ১ ⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ
পাঠ - ২ ⇒	১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ
	৬. গ	৭. ঘ			
পাঠ - ৩ ⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ	৫. ঘ
	৬. গ				